গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা | ২০ - ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিজেপি নেতার কুৎসার তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

আর জি কর আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)-র ভূমিকাকে কটাক্ষ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন,

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন, আমাদের দল এ রাজ্যে যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সুশৃঙ্খল ও সুসংহতভাবে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আর জি কর হাসপাতালের নারকীয় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পক্ষে প্রথম থেকেই আমাদের দল সর্বশক্তি নিয়ে আছে। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত, দৃপ্ত প্রতিবাদী আন্দোলনকে আমরা সব সময়ই যথাযথ মর্যাদা দিই এবং দাবি পূরণের লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত লড়াই করি। বিজেপি বা অন্য দলের মতো নির্বাচনী স্বার্থকে সামনে রেখে আমাদের দল আন্দোলন করে না। ফলে বিজেপি নেতার উদ্দেশ্য প্রণোদিত কুৎসা প্রচারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে বিভ্রান্ত হবেন না, তা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দৃঢ়পণ আন্দোলনে জয় ছিনিয়ে আনলেন জুনিয়র ডাক্তাররা

সঠিক রাস্তায় লাগাতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপই যে দাবি আদায় করতে পারে, তা আবারও প্রমাণিত হল। ১৬ সেপ্টেম্বর জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে অনেকগুলি দাবিই মেনে নিতে বাধ্য হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা পুলিশ কমিশনার, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ও ডিসি নর্থকে সরানোর দাবি তাঁকে মানতে হল। হাসপাতালের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবিও মেনে নেন তিনি। মুখ্যসচিবের অধীনে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা তিনি ঘোষণা করেন। বৈঠক শেষে স্বাস্থ্যভবনের সামনে ধরনাস্থলে ফিরে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষে ডাঃ অনিকেত মাহাতো বলেন, আন্দোলনের এ এক উল্লেখযোগ্য জয়। তিনি বলেন, সিনিয়র চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ সক্রিয় ভাবে অংশ না নিলে এই আন্দোলন জয়যুক্ত হত না। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে তিনি এঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানান।

যে মুখ্যমন্ত্রী ঔদ্ধত্যের সাথে বলেছিলেন, অনেক

দুয়ের পাতায় দেখুন

● *মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর স্বাস্থ্যভবনের সামনে আন্দোলনস্থলে বক্তব্য রাখছেন জুনিয়র ডাক্তার নেতৃবৃন্দ*

এসইউসিআই(সি)-র অভিনন্দন

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের এই উল্লেখযোগ্য জয়ে এস ইউ সি আই (সি) কমিউনিস্ট-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে আন্দোলনকারী চিকিৎসক সহ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত স্তরের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান। তিনি দাবি জানান, এখনও যে যে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আন্দোলনকারীদের মতান্তর থেকে গেছে, সেগুলি তিনি যেন জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলেন।

আর জি কর আন্দোলন আগামী দিনের গণআন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করবে

কমরেড প্রভাস ঘোষ

৯ আগস্ট আর জি কর মেডিকেল কলেজের নারকীয় ঘটনার পর এক মাস পেরিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে শুধু কলকাতা নয়, এই রাজ্য, এমনকি বিশ্ব জুড়ে মানুষ এই নৃশংস ঘটনার বিচার চেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। সর্বত্র দাবি উঠেছে, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এই আন্দোলনে মহিলারাও বিপুল সংখ্যায় অংশ নিয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে ইউটিউব চ্যানেল ‘সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ’-এর পক্ষ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট)-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের কাছে। প্রশ্নোত্তরে সেই আলোচনাটি আমরা গণদাবীতে প্রকাশ করলাম।

প্রশ্ন ঃ আর জি করের ঘটনায় শুরু থেকে রাজ্য সরকারের যে ভূমিকা তাতে সাধারণ মানুষের অভিমত যে, সরকার বোধহয় কিছু লুকোতে চাইছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ বোধহয় নয়, এটা বাস্তব সত্য। এই বর্বর ঘটনার পর প্রথম থেকেই সরকারের যে ভূমিকা তাতে অত্যন্ত পরিষ্কার যে সরকার কিছু ধামাচাপা দিতে চাইছে। এখানে বোধহয়ের কোনও জায়গা নেই। যে খবরগুলি প্রকাশ্যে এসেছে, যেমন, মৃতদেহ দেখার পর এফআইআর হল চোদ্দ ঘণ্টা বাদে। এটা কোনও গ্রামাঞ্চল বা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা নয়

তিনের পাতায় দেখুন

প্রতিবাদী চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে এফ আই আর দিল্লি পুলিশের

আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে সারা দেশের চিকিৎসকরা রাজপথে নেমেছেন। দিল্লির চিকিৎসকরাও নির্মাণ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ তাঁদের এই জমায়েতে বাধা দেয় এবং ২১ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তুঘলক রোড থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ ও ১৪৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের করে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লি এইমস, সফদরজং হাসপাতাল, লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ, রামমনোহর লোহিয়া ও গুরু তেগবাহাদুর হাসপাতাল এবং মওলানা আজাদ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা।

লক্ষণীয় বিষয়, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর জি কর ঘটনার কোনও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ না করলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীন পুলিশ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে এতটুকু দেরি করেননি। অন্য দিকে এ রাজ্যের বিজেপিও মূল দাবিতে আন্দোলন তীব্র করার পরিবর্তে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে আন্দোলনের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার নানা চেষ্টা করছে। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপির রাজ্য শাখার পক্ষ থেকেও এই এফআইআরের কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। তাদের এই আচরণের দ্বারা বিজেপি রাজ্যের তৃণমূল সরকারের আন্দোলন বিরোধী ভূমিকাকেই শক্তিশালী করল এবং নির্যাতিতা তিলোত্তমার ন্যায়বিচারের দাবির প্রতি অবিচার করল। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সর্বভারতীয় সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাস এই এফআইআর-এর তীব্র নিন্দা করে বলেন, অবিলম্বে এই এফআইআর খারিজ করতে হবে। চিকিৎসকদের ন্যায্য আন্দোলনের ওপর এই আক্রমণ চরম অগণতান্ত্রিক।

জয় ছিনিয়ে আনলেন জুনিয়র ডাক্তাররা

একের পাতার পর

আন্দোলন হয়েছে এবার উৎসবে ফিরুন, যিনি ১১ সেপ্টেম্বর নবান্ন সভাঘরে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনার লাইভ স্ট্রিমিংয়ের সামান্য দাবিটুকুও মানতে রাজি ছিলেন না— ১৪ সেপ্টেম্বর ধরনাস্থলে আসতে হয়েছিল তাঁকেই। যে সিবিআই এক মাসে তদন্তের কাজে কোনও অগ্রগতি দেখাতে পারেনি, তারাও আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসিকে অভয়ার খুন-ধর্ষণের মূল মামলায় গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হল। জুনিয়র ডাক্তারদের লাগাতার দৃঢ়পণ লড়াই, আর সেই লড়াইয়ে জনসাধারণের বাঁধভাঙা সক্রিয় সমর্থন না থাকলে, সরকারের দিক থেকেও এই নমনীয়তা দেখা যেত না।

সরকার ভেবেছিল, সুপ্রিম কোর্টের নাম করে ডাক্তারদের কাজে ফেরার হুমকি দিলেই জুনিয়র ডাক্তাররা ভয় পেয়ে আন্দোলন তুলে নেবেন। কিন্তু দেখা গেল জুনিয়র ডাক্তার সহ রাজ্যের সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অনড়। স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান কার্যত আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। প্রতিদিন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ তাঁদের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তারদের জন্য তাঁরা খাবার, জল, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে ছুটে এলেন।

এই আন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয় অনেক আগেই। জনসমর্থন আরও ব্যাপক আকার নিচ্ছে দেখেই ১৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী ধরনাস্থলে গিয়ে আবার তাঁদের আলোচনায় ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বহু আশা জাগিয়েও আলোচনা সেদিনও হতে পারেনি। ডাক্তাররা যে সঙ্গত কারণেই স্বচ্ছতার প্রশ্নটা বারবার তুলেছেন তা মানুষ বুঝেছে। সরকার আলোচনাটা ভেস্তে দিতে বদ্ধপরিকর বুঝে তাঁরা সরাসরি সম্প্রচারের পরিবর্তে নিজেদের ভিডিওগ্রাফার দিয়ে ছবি তুলে রাখা, এমনকি সরকার তা নিয়ে টালবাহানা করার পর দুই পক্ষের সই করা মিনিটস রাখা হবে এই শর্তেও রাজি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি টালবাহানায় বৈঠক হতে পারেনি।

মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে জনগণ এই আলোচনা শুনলে সরকারের অসুবিধা কোথায়? যখন গোটা রাজ্যের মানুষ সরাসরি এই আন্দোলনের সাথে একাত্ম, তখন তাঁদের আলোচনার গতিপ্রকৃতি সরাসরি জানতে দিতে সরকার কি ভয় পাচ্ছে? আইনগত কোনও বাধাও যে নেই তা জানিয়েছেন বিশিষ্ট আইজীবীরাও। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, সিবিআই বন্ধ খামে আদালতকে যাই জানাক, অন্তত তার মূল কথাগুলো তারা জনগণকে জানাবে না কেন? এটা তো কেবলমাত্র সিবিআই ও কোর্টের বিষয় নয়! রাজ্য সরকারের কাছে মানুষের প্রশ্ন— সুপ্রিম কোর্ট কি শুধু জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার কথাটুকুই ৯ সেপ্টেম্বর বলেছে? আদালতে ভক্তি এত হলে রাজ্য সরকার বলুক তাদের পুলিশ ও প্রশাসনের যে গাফিলতিগুলি দিকে সুপ্রিম কোর্ট আঙুল তুলেছে সে বিষয়ে তারা কী করেছে। তদন্তকে কার্যত বিপথে চালনা করার চেষ্টা যে পুলিশ করেছে তা আজ মানুষ বুঝেছে। টালা থানার ওসি-র গ্রেপ্তারিতে তা আরও স্পষ্ট।

সুপ্রিম কোর্ট নানা প্রশ্ন ইতিমধ্যেই তুলেছে। তার মধ্যে এফআইআর করতে ১৪ ঘণ্টা দেরি থেকে শুরু করে ময়নাতদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় নথি বা চালান না থাকা সহ নানা গাফিলতির কথা আছে। এই সব গাফিলতি যার নির্দেশেই ঘটুক, প্রশাসনিক কর্তা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এর দায় এড়াতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরাও ইঙ্গিত করেছেন তথ্যপ্রমাণ লোপাটের দিকে। ফলে ন্যায়বিচার কতটুকু আদালতের চৌহদ্দিতে মিলবে তার উত্তর ভবিষ্যতই বলবে।

জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি ছিল মাত্র পাঁচটি— ১) অভয়ার খুন-ধর্ষণের জন্য দায়ী সমস্ত দোষীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে, ২) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রমাণ লোপাটে যুক্ত সকলকে শাস্তি দিতে হবে। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, স্বাস্থ্য দফতরের ডিএমই, ডিএইচএস ও স্বাস্থ্যসচিবকে অপসারণ করতে হবে, ৩) কলকাতা পুলিশের অপদার্থতার দায় নিয়ে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে পদত্যাগ করতে হবে, ৪) সমস্ত হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মী সহ সকল কর্মীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ৫) প্রতিটি মেডিকেল কলেজে শাসকদলের সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সমস্ত কমিটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এগুলি এখন সারা রাজ্যের সাধারণ মানুষেরও দাবি। লাগাতার আন্দোলনের তীব্রতা দেখে এর অনেকগুলিই মেনে নিল সরকার।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও হুমকির যে নোংরা সংস্কৃতি চলছে তার বিরুদ্ধে এতদিন ধরে বারবার নানা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা লড়েছেন। চিকিৎসকদের নানা সংগঠনও তা বলেছেন। অভয়ার বিচারের দাবিতে আন্দোলনের অভিঘাত তাকে একেবারে সামনে এনে দিয়েছে। যে ভয়াবহ দুর্নীতির কথা শোনা যাচ্ছে তা যে অমূলক নয়, তা আরও বোঝা গেল মুখ্যমন্ত্রী যখন জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনস্থলে দাঁড়িয়ে সমস্ত হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিগুলি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। বোঝা যাচ্ছে এই বিষচক্রের কথা তাঁর অজানা ছিল না। তিনি কোনও টেন্ডারে সই করেছেন কি না সেটা বড় কথা নয়, তাঁর দফতরের এই দুর্নীতি দূর করার বিষয়ে তিনি কী করছেন এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্যই জুনিয়র ডাক্তাররা আলোচনার স্বচ্ছতা চেয়েছিলেন।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনে গ্রাম-শহর সর্বত্র যে জনজাগরণ দেখা যাচ্ছে তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের যে ঢল নামে তাও ঐতিহাসিক। এই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় দিল্লির কৃষক আন্দোলনের কথা। খাবার, জল, ওষুধ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে মানুষ উপস্থিত হয়েছেন প্রতিদিন। দরকার নেই, বলে আন্দোলনকারী ডাক্তাররা অনেক কিছু ফিরিয়ে দিলেও মানুষ থামেননি। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে একটানা বৃষ্টি শুরু হলে বহু মানুষ বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন আন্দোলনকারী ছেলেমেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তায়। অনেকে চৌকি, পাটাতন, ফোম, ত্রিপল জোগাড় করে পৌঁছে গেছেন আন্দোলনকারীদের দিতে। চাকরিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসকরাই শুধু নন, ফেরিওয়ালা, হকার, অনলাইন খাবার ডেলিভারি বয় থেকে শুরু করে খবরের কাগজ বিক্রেতারাও তাঁদের রোজগারের টাকা তুলে দিয়েছেন আন্দোলনকারীদের হাতে। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল ন্যায়সঙ্গত দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন কী ভাবে গোটা সমাজে জাগরণ আনতে পারে, পারে মনুষ্যত্বের স্ফূরণ ঘটাতে। জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে হতাশায় ভুগতে থাকা মানুষও যে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন— দেখিয়ে দিল এই ঐতিহাসিক সময়।

জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলন অনেকগুলি দাবিই ছিনিয়ে আনতে পারল। অভয়ার ন্যায়বিচার আদায় করতে পেরোতে হবে আরও অনেকটা পথ। পাশাপাশি এই আন্দোলন সমাজের বহু অন্যায়ের প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছে মানুষের মনে— যা এক বড় অর্জন।

‘অভয়া’-র ন্যায়বিচার পেতে ৫ দফা দাবিতে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে স্বাস্থ্যভবন পর্যন্ত মহামিছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার মগরাহাট এলাকার কর্মী, দলের পূর্বতন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আব্দুল মুজিদ গাজি ১৯ আগস্ট জয়নগর স্বাস্থ্যসদনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। কমরেড আব্দুল মুজিদ গাজি পরাধীন ভারতে এক প্রভাবশালী কংগ্রেসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের আবর্তে তিনি বেড়ে ওঠেন। পারিবারিক নানা কারণে পুঁথিগত শিক্ষার সুযোগ বেশিদূর হয়নি কিন্তু ছোট থেকেই তিনি যুক্তিবাদী ও প্রতিবাদমনস্ক ছিলেন। আর্থিক উপার্জনের কারণে ছোট থেকেই বিড়ি বাঁধার কাজ শুরু করেন। রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ থেকে ছোটবেলায় বামপন্থী আন্দোলন ও সিপিআই-এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে কারারুদ্ধও হয়েছিলেন।

বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনে নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে নেতৃত্বের সাথে মতবিরোধের ফলে সিপিআই-এর সাথে তাঁর ছেদ ঘটে। পরে মগরাহাটে এস ইউ সি আই (সি)-র তৎকালীন নেতা কমরেড সনৎ ব্যানার্জীর সাথে পরিচয় হয় তাঁর। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মধ্যে বামপন্থী আন্দোলনে নৈতিকতার প্রশ্ন তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলে যোগ দেও এবং কাজ শুরু করেন। এই সময় কমরেড সনৎ ব্যানার্জী তৎকালীন আন্দোলনে কারারুদ্ধ হওয়ায় তিনি সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

মগরাহাট থানা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন অংশের বিড়ি শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন করার মাধ্যমে জেলার বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন তিনি। এ ছাড়াও ভ্যান, মোটরভ্যান আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। জেলার শ্রমিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে এক সময়ে শ্রমিক ইউনিয়ন এআইইউটিইউসি-র সহসভাপতি নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ সময় ধরে জেলার শ্রমিক ইউনিয়নের বহু দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও মগরাহাটের খনকার বাজারে পোস্ট অফিসের আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রাহক কমিটি গড়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনেও মগরাহাটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

পরিবারে প্রচণ্ডআর্থিক সংকট ও অভাব-অনটনের মধ্যেও দলীয় কাজকে সর্বদা প্রাধান্য দিতেন। তাঁর কথায়, আলোচনায় আর্থিক অনটনের বিষয়টা কখনওই প্রকাশ পেত না। দলের কর্মীদের খাওয়ানো এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হতেন। তাঁর দরদি, স্নেহপ্রবণ ব্যবহার, পিতৃসুলভ আচরণ বঞ্চিত-শোষিত বিড়ি শ্রমিক সহ অনেকের মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। কমরেড মুজিদ গাজী সর্বদা দলের পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন বইপত্র খুঁটিয়ে পড়তেন, অফিসে যাঁরা আসতেন সমসাময়িক ঘটনা সহ জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়, তত্ত্বগত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। শাসকদলের সন্ত্রাস সত্ত্বেও আমৃত্যু দলের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এক সময় তিনি টিবি রোগে আক্রান্ত হন। পরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগতে থাকেন এবং এই রোগ স্থায়ী হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুতে শ্রমিক-কর্মচারীরা হারালেন তাঁদের প্রিয় নেতাকে। দল হারাল শ্রমিক আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতাকে।

কমরেড আব্দুল মুজিদ গাজি লাল সেলাম

আর জি কর আন্দোলন গণআন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করবে

একের পাতার পর

যে, থানা থেকে আসতে অনেক সময় লাগে। পাশেই থানা, তবু এত সময় লাগল কেন? ময়নাতদন্ত হল চালান ছাড়াই। সুপ্রিম কোর্টও এই প্রশ্নটা তুলেছে। পোশাক নিয়েও দু-রকম রিপোর্ট। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, হাসপাতালের অন্য কোথাও নয়, তার পাশের অংশই ভেঙে ফেলা হল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সরকারি প্রশাসন কিছু চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মৃতদেহ দাহ করার জন্য পুলিশ এত ব্যস্ততা দেখাল কেন? শেষ মুহূর্তে এমনকি বাবা-মাকেও না জানিয়ে মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হয়ে গেছে পুলিশ। বাবা-মা বার বার কাতর আবেদন জানিয়েছেন। তিন ঘন্টার বেশি তাঁদের মৃত মেয়ের মুখটা পর্যন্ত দেখতে দেয়নি। বাবা-মাকে টাকা অফার করা হয়েছে। কেন টাকা অফার করা হল? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাবা-মা যদি মেয়ের স্মৃতিতে কিছু করতে চান তার জন্য। এটা একটা ছেঁদো যুক্তি। বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথম থেকে যা কিছু শোনা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট, রাজ্য সরকার কিছু চাপা দিতে চেষ্টা করছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে এই যে ধারণা তৈরি হয়েছে তা খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত।

এনসিআরবি-র একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দেশে প্রতি ১৫ মিনিটে এক জন মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছেন। এ রাজ্যেও তৃণমূল শাসনে কামদুনি সহ অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু এই রকম একটা গণবিস্ফোরণ, বিশেষ করে নারী সমাজের ভূমিকা— এমনটা কিন্তু আগে দেখা যায়নি। রাজ্য এবং দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। এটাকে আপনি কী ভাবে দেখছেন।

এ ক্ষেত্রে নারী সমাজের যে ভূমিকা তা ঐতিহাসিক এবং একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। স্বদেশি আন্দোলনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নারী আন্দোলনের এত ব্যাপকতা, গভীরতা, বলিষ্ঠতা দেখা যায়নি। তা ছাড়া পনেরো মিনিটে একজন ধর্ষিতা হচ্ছেন— এটা সরকারি হিসাব। বাস্তবে প্রতি মিনিটে কত ধর্ষণ হচ্ছে কোথাও না কোথাও— যার খবর সরকার জানে না, রাখে না, রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। সংবাদমাধ্যমে এর সামান্য কিছু রিপোর্ট পাওয়া যায়। প্রতিবাদে যাঁরা সোচ্চার হয়েছেন সেই মহিলারা বা তাদের আত্মীয়রা অথবা পরিচিতরা অনেকেই ভুক্তভোগী— রাস্তায়-বাসে-ট্রেনে তাঁদের মর্যাদাহানি হয়, শ্লীলতাহানি হয়। ফলে একটা পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ছিল, যার বিস্ফোরণ এটা।

পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সাধারণ মানুষের মধ্যেও আছে, নারী সমাজের মধ্যে বিশেষ ভাবে আছে। আর এটা একটা অত্যন্ত বীভৎস মর্মান্তিক ঘটনা। একজন চিকিৎসক, যিনি রোগীদের সেবা করেন, তাঁর হাসপাতালের মধ্যেই এ রকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে, মানুষ সেটা ভাবতেই পারেনি। আমি যতদূর জানি, এর আগে কখনও হাসপাতালের মধ্যে মহিলা ডাক্তারের খুন-ধর্ষণের এমন ঘটনা ঘটেনি। ফলে এর বীভৎসতাটা, নারকীয়তাটা ভয়াবহ ভাবে মানুষের কাছে এসেছে। একটা আতঙ্ক তৈরি করেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এত দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। দীর্ঘ দিন ধরে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন ঘটে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের জীবনের আরও নানা সমস্যা— মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাই, নিরাপত্তার অভাব। সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবল দুর্নীতি। নিরপেক্ষ প্রশাসন বলে কোনও কিছু নেই। সমস্ত ক্ষেত্রে দলীয় আধিপত্য, সরকারি দলের আধিপত্য। শুধু এখন বলে নয়, এখন তো বটেই, এই সব কুকীর্তি প্রতিটি শাসক দলের ক্ষেত্রেই মানুষ দেখেছে। কংগ্রেস দীর্ঘ দিন কেন্দ্রে-রাজ্যে শাসন করেছে। এখন বিজেপি করছে কয়েকটি রাজ্যে এবং কেন্দ্রে। অন্যান্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিও বিভিন্ন রাজ্যে শাসন করেছে ও করছে। সিপিএম তিনটি রাজ্যে শাসন করেছে। এখন শুধু কেরালায় আছে। ঠিক এই মুহূর্তে কেরালায় সিপিএম শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ চলছে। চলচ্চিত্র অভিনেত্রীরা প্রথম বিদ্রোহ করেছেন। অভিযোগ উঠেছে, অভিনেত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগের তদন্তে গঠিত হেমা কমিটির রিপোর্ট কেরালা সরকার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। হাইকোর্ট আজ রাজ্য সরকারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে যে, কেন এতদিন রিপোর্ট ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে! আরও একের পর এক অভিযোগ উঠছে। তা দেখে এ রাজ্যের টালিগঞ্জেও অভিনেত্রীদের একটি অংশ একই অভিযোগ তুলেছেন।

এ রকম ঘটনা ঘটেই চলেছে। যার ফলে একটা পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ছিলই নারীসমাজের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে এবং এর কোনও প্রতিকার কোথাও দেখা যায়নি। আর জি করের ঘটনাটা একটা স্ফুলিঙ্গ হিসাবে কাজ করেছে। এর নারকীয়তাটা, বীভৎসতাটা মারাত্মক। এর সাথে এত দিনের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটেছে এ দেশে এবং বিদেশে। বাংলাদেশের আন্দোলনও এখানে অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। বাংলাদেশে যে বিরাট আন্দোলন অত্যাচারী সরকারকে সরিয়ে দিল, সেখানেও নারীদের বিরাট ভূমিকা ছিল। মুসলিম নারীদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা— কেউ মানেনি। সবাই রাস্তায় নেমে গিয়েছিলেন। মেয়েরাও শহিদ হয়েছেন— মুসলিম মেয়ে, হিন্দু মেয়ে সবাই লড়াই করেছেন। এই ঘটনা সবাইকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে।

এই আন্দোলন আগামী দিনে গণআন্দোলনের উপর কেমন প্রভাব ফেলবে?

এই ঘটনা আগামী দিনে গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শাসক দলগুলো এটাকে কী চোখে দেখছে তারাই বলতে পারবে। কিন্তু নারী সমাজের এমন সক্রিয় অভ্যুত্থান, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে যে তারা তাদের বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটাল এটা আগামী দিনের গণআন্দোলনগুলিকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করবে, সাহায্য করবে।

এই আন্দোলনে একটা নতুন বৈশিষ্ট্য আমরা দেখছি যে, সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি, সরকারি দলগুলি—তাদের কারও প্রতি মানুষের কোনও ভরসা নেই।

তার কারণও আছে। এই সব রাজনৈতিক দলগুলিই সরকারে ছিল এবং আছে। এদের সবাইকে মানুষ দেখেছে। কংগ্রেসকে দেখেছে, বিজেপিকে দেখেছে, সিপিএমকে দেখেছে, এখন তৃণমূলকে দেখছে। প্রত্যেকটি সরকার সম্পর্কে মানুষের ধারণা— এরা জনগণের জন্য কিছু করে না। এরা শুধু মালিক শ্রেণি, পুঁজিপতি-ধনিক শ্রেণির স্বার্থেই দলীয় শাসন চালায়, পতাকা যা-ই হোক, স্লোগান যা-ই হোক। তাদের একটাই লক্ষ্য— বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে কাজ করা। সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে, সংকটে জর্জরিত হচ্ছে। অথচ এই দলগুলি সব দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে— উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। এদের সম্পর্কে মানুষের এটাই ধারণা। প্রত্যেকটি সরকারি দল সম্পর্কে মানুষ অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ।

পাশাপাশি দেখছি, আমরা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) যখন জনগণের কাছে যাচ্ছি আমরা কিন্তু মানুষের অনেক ভালবাসা পাচ্ছি, সমর্থন পাচ্ছি। ১৪ আগস্ট রাতে আর জি করে আন্দোলনের উপর হামলা হল। কারা করল এটা পরিষ্কার। কারণ, আন্দোলনকারীদের উপর কে হামলা করবে? হয় পুলিশ, না হয় সরকারি দলের আশ্রিত সমাজবিরোধীরা। এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝরাতে আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) সিদ্ধান্ত নিল— এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। দল ১৬ আগস্ট রাজ্য জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। ১৫ আগস্ট ছিল ছুটির দিন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলের কর্মীরা প্রচার করেছে সারা রাজ্যে। সংবাদপত্রে প্রচারের কোনও সুযোগ হয়নি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কিছু কিছু প্রচার হয়েছিল। কিন্তু এই ধর্মঘটে ছিল অভূতপূর্ব সাড়া। কলকাতায় সরকার বাস চালিয়েছে, রাজ্যে ট্রেন চালিয়েছে, কিন্তু যাত্রী বিশেষ ছিল না। আমাদের ডাকে মানুষ এ ভাবে সাড়া দিল। পাশাপাশি বিজেপি নবান্ন অভিযানের নামে একটা নকল-লড়াই করল। পরের দিন ধর্মঘট ডাকল। মানুষ কিন্তু সেই ডাকে বিশেষ সাড়া দেয়নি। জবরদস্তি কিছু করার চেষ্টা করেছে। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়— এই সব রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে জনগণের অনাস্থা এবং আমাদের দল সম্পর্কে একটা আস্থা এবং ভরসা গড়ে উঠেছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। জনগণ বুঝতে পারছে বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস আন্দোলনের নামে যা কিছু করছে, সবই আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে। আর আমরা করছি দাবি আদায়ের জন্য, আন্দোলনকে সফল করার জন্য।

৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট যা বলল তাতে মনে হচ্ছে কোর্ট কোথাও যেন এই আন্দোলনের রাশটাকে একটু টেনে ধরতে চাইছে। আপনি কী বলবেন?

আমারও তাই মত। সুপ্রিম কোর্ট হতাশ করেছে জনগণকে। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটাকে হাইকোর্টের থেকে টেক-আপ করেছিল। মানুষের একটা আশা জেগেছিল। যদিও নিউট্রালিটি বা নিরপেক্ষতা বলতে যা বোঝায় জুডিশিয়ারির সে নিউট্রালিটি এখন প্রায় নিছক কথার কথা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এটা মানুষের ধারণা, আমাদেরও ধারণা। এই যে সিবিআই, এক মাস হয়ে গেল, একজন দুষ্কৃতীকেও ধরতে পারল না, চিহ্নিত করতে পারল না। সিবিআইকে চালায় কে? কেন্দ্রীয় সরকার। এটাও তো বিস্ময়কর। তারা দুর্নীতি ধরেছে। ঠিকই আছে। কিন্তু দুর্নীতি একটা সাইড ইস্যু। মানে পূর্বতন অধ্যক্ষের যে দুর্নীতি-চক্র কাজ করত, তারা কী ভাবে অসৎ পথে টাকাপয়সা আত্মসাৎ করত, এগুলি প্রকাশ্যে আসছে। এটা ঠিক আছে। কিন্তু মূল যে দায়িত্ব, অপরাধীকে চিহ্নিত করা, কারা এর নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছে— এখন পর্যন্ত কিছু প্রকাশ্যে এল না। সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস ডিলেইড। প্রবচনে আছে, জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। সুপ্রিম কোর্টে ধীরগতির বিচার শেষ পর্যন্ত বিচারহীনতায় পরিণত হবে কি না তা ভবিষ্যতই বলবে। শুনানি যা হল তা খুবই হতাশাজনক। যার জন্য আমরা বলেছি, আন্দোলনকে তীব্র করতে হবে। আবার এ কথাও আমরা বলেছি, হয়তো অপরাধী কেউ ধরা পড়তে পারে, হয়ত শাস্তিও হতে পারে। অতীতে কিছু কিছু শাস্তি হয়েছেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়নি। যেখানে অপরাধী সরকারের আশ্রিত, সেখানে শাস্তি হয়নি। যেখানে সাধারণ লোক ধরা পড়েছে, সেখানে কিছু কিছু শাস্তি হয়েছে। কিন্তু শাস্তি হোক আর না হোক, এই কিডন্যাপিং, ইভটিজিং, রেপিং, মাস-রেপিং, মার্ডার— এগুলি চলছে, চলবে, বাড়বে। এগুলি আগে ছিল না। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সময় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র দেখেননি। নজরুল দেখেননি। স্বদেশি আন্দোলনের সময় এ-সব ছিল না। তখন ছাত্র-যুবকদের একটা নৈতিক মান ছিল। কারণ তখন দেশে নবজাগরণের আন্দোলন ছিল। নবজাগরণ একটা নৈতিকতা দিয়েছিল, মানবিক মূল্যবোধ দিয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনও একটা মূল্যবোধ দিয়েছিল, চরিত্র দিয়েছিল। ছাত্র-যুবকরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

আর এখন দেশের অবস্থা কী? পুঁজিপতি শ্রেণি, তারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত। তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্ট আইন ভাঙে। আইন আইনের পথে চলে না, আইনকে যারা চালায়, সেই পথেই চলে। এমনিতে তো প্রচলিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আইনের পথে শোষণ চলছেই, মুনাফা লুটছেই, শ্রমিক বঞ্চিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে। স্থায়ী কাজ উঠেই গেছে, চুক্তির ভিত্তিতে কাজ এখন। বেশির ভাগই পরিযায়ী শ্রমিক— বিদেশে চলে যাচ্ছে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, মারাও যাচ্ছে। ইজরায়েলে চলে গেছে। কারণ, ওখানে আগে প্যালেস্টাইনের গরিবরা কাজ করত। এখন সেখানে এই দেশের গরিবরা কাজ করছে। দেশে-বিদেশে সর্বত্র মাইগ্র্যান্ট লেবাররা ছুটছে যা হোক কিছু রোজগারের জন্য। এ রকম ভয়াবহ অবস্থা গোটা দেশে। পুঁজিবাদী শোষণের ফলেই এই সব ঘটছে।

পুঁজিপতিরা নিজেরা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়। ব্যাঙ্ক

চারের পাতায় দেখুন

রাজপথে প্রতিবাদী শিক্ষকসমাজ

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়ে গড়ে ওঠা 'টিচার্স ফর আর জি কর'-এর নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল ১৪ সেপ্টেম্বর করুণাময়ী থেকে বেলা ১টায় সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছয়। সেখানে শিক্ষকরা অবস্থান করেন ও জনতার আদালত বসান

প্রতিবাদের এই উৎসব যেন না থামে

'একমাস তো হল, একমাস একদিন ... এবার পুজোয় ফিরুন, উৎসবে ফিরুন।'

৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যবাসীর কাছে এই ভাষায় 'অনুরোধ' করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় বা স্বরপ্রক্ষেপণে আন্দোলনরত জনগণের প্রতি অনুরোধের সুর যে বিন্দুমাত্রও ছিল না তা বলাই বাহুল্য। প্রশ্ন উঠেছে, মানুষের অন্তরের যন্ত্রণা ক্ষোভ রাগ প্রকাশের, প্রতিবাদের কি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায়! মর্মস্পর্শী ঘটনায় উৎসবের আলো যখন ম্লান হয়ে পড়েছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর মানুষকে উৎসবে ফিরে আসার বার্তা দেওয়া কী ইঙ্গিত করে? তা যে কোনও প্রকারে প্রতিবাদ আন্দোলনের অভিমুখকে বিপথে চালিত করার অপচেষ্টা নয় কি? আর জি কর হাসপাতালের নারকীয় কাণ্ডের বিচারের দাবি যাদের বুকে ধিকিধিকি আগুন হয়ে জ্বলছিল, মুখ্যমন্ত্রীর এই 'অনুরোধ' সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে আর একবার। তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে গোটা বাংলা ও দেশের বিবেকবান মানুষ।

মানুষের মন ভাল নেই। শারদোৎসব এই বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব। মানুষ এই উৎসবের দিন গোনেন, উৎসবের জন্য নানা আয়োজন করেন। না, মানুষের মধ্যে সে আমেজ বা মেজাজ এখন নেই। মানুষ এখন বিচার চেয়ে মিছিলের আয়োজন করছেন অথবা মিছিল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোনও আয়োজনে কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হচ্ছেন। তাঁরাই স্লোগান তুলছেন— 'আমার বোনের শব মাড়িয়ে উৎসবে ফিরছি না।' মানুষের অন্তরকে ঠিক কোন জায়গায় বিদ্ধ করেছে এ ঘটনা, তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দলের বহু কর্মীও তাঁর এই অসংবেদনশীলতায় বিস্মিত।

কিন্তু এমনটা হল কেন? কেন মানুষের বিচারের দাবিকে প্রশমিত করতে উৎসবকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে? বরং বিপরীতটাই তো হওয়ার কথা ছিল। একটা সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থায় যদি কোনও অপরাধ ঘটে যায় তবে সেই ঘটনার সমস্ত দায়ভার সরকার, প্রশাসন গ্রহণ করবে এবং দ্রুত তার বিচারের জন্য তৎপর হয়ে উঠবে— এটাই তো স্বাভাবিক। কেন সাধারণ মানুষকে, চিকিৎসকদের মাসাধিক কাল ধরে রোদ-বৃষ্টিতে রাস্তায় থাকতে হবে? গলদটা এইখানে। ব্যবস্থাটা তো সুষ্ঠু পথে চলছে না। ঘুণপোকায় ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া এই ব্যবস্থাটাকে আসলে আড়াল করতে চাইছে সরকার। একটা ঘটনার কিনারা করতে গিয়ে আরও বহু অপরাধচক্র, দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা সামনে চলে আসবে— এ আশঙ্কা সরকারকেও আতঙ্কিত করে তুলেছে।

জনসাধারণও তা আঁচ করতে পারছেন। আর তাই মুখ্যমন্ত্রী বা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি কারও কোনও কথা বা পদক্ষেপই আর বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে না জনতার কাছে। সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলবে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের কাছে যে ৫ দফা দাবি উত্থাপন করেছেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা, তাও বিচার পাওয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই দাবিগুলি পূরিত না হওয়া পর্যন্ত আগুন নিভবে না, ক্ষোভ প্রশমিত হবে না। মানুষকে কোনও মতে উৎসবের ডামাডোলে ভিড়িয়ে দিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন— 'মানুষের উৎসব কবে? ... প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী— কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।' সত্যিই আজ সেই উৎসবের দিন। মানুষ তার প্রতিদিনের ক্ষুদ্র দীন একাকী জীবন থেকে বেরিয়ে এসে দল-মত-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্যত্বের শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন পথে-ঘাটে। ব্যক্তিগত পরিসরের দুঃখ ব্যথার সীমানা পেরিয়ে সামাজিক দুঃখ-যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে আপন গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসছেন। পরিচিত অপরিচিত আরও বহু মানুষের হাত ধরে গড়ে নিচ্ছেন মহত্তর এক মানবশৃঙ্খল। সমস্ত অন্ধকারের মাঝে, মন খারাপের মাঝেও জনতার এই প্রতিবাদের উৎসব বড় সুন্দর। এটাই জনগণের অন্তরের উৎসব।

হয়তো প্রতিবাদী মানুষের প্রতিরোধের ধারায় সত্য একদিন উদঘাটিত হবে। তিলোত্তমা বিচার পাবে। তবে কল্লোলিত জনতার এই প্রতিস্পর্ধার আগুন যেন নিভে না যায়। এরই মধ্যে নিহিত আছে শতচ্ছিন্ন এই সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে আগামীর নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপ্ত সম্ভাবনা। তাই প্রতিবাদের এই উৎসব যেন কখনও না থামে।

আর জি কর আন্দোলন সম্পর্কে

কমরেড প্রভাস ঘোষ

তিনের পাতার পর

থেকে টাকা নেয়, টাকা শোধ করে না, সুদ দেওয়া তো দূরের কথা। ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে দিচ্ছে, মানে সরকার মকুব করে দিচ্ছে। কালো টাকা বিদেশে সঞ্চয় করছে। এ সব তো ঘটছেই। গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। সব দলের সরকারই আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। কাটমানি, ঘুষ ছাড়া কোনও কাজই হয় না। গোটা সমাজকেও তা দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। তারা গোটা দেশে কী সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে? ড্রাগের নেশা, মদের নেশা, জুয়া খেলো, সাট্টা খেলো, নারীদেহ নিয়ে নোংরা আলোচনা করো, ব্লু-ফিল্ম দেখো, আর ফিল্মস্টার, প্লেয়ারদের বিরাট কাহিনি থাকে খবরের কাগজে— সে সব পড়ো। খবরের কাগজে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই, বিদ্যাসাগর, ফুলে, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বড় মানুষরা নেই। প্রতিদিন খবরের কাগজের দুটি-তিনটি পাতা জুড়ে থাকে খেলোয়াড় আর ফিল্মস্টারদের কাহিনি। তারা কী চরিত্র দেবে? এইভাবে যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে।

কেউ তো ধর্ষক হয়ে জন্মায় না। মাতৃগর্ভ থেকে যে শিশু জন্মায়, সেই শিশু মূল্যবোধ কোথা থেকে পায়? মাতৃগর্ভ থেকে পায় না, পায় সামাজিক পরিবেশ থেকে। নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেও মানুষ সামাজিক পরিবেশ থেকে মূল্যবোধ পেয়েছিল। সেটা ছিল উন্নত মূল্যবোধ। এখন পরিবেশ ভিন্ন। এই পরিবেশ কিশোরদের, যুবকদের অমানুষ করছে, মনুষ্যত্বহীন, মূল্যবোধহীন করছে। যার জন্য বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে, নাবালক ভাই নাবালিকা বোনকে ধর্ষণ করছে, পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করছে। ৮০ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করছে, কেউ ভাবতে পারে এই জিনিস! কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেশকে! এর জন্য পুঁজিবাদ দায়ী। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, আর পুঁজিবাদের স্বার্থবাহী এই শাসক দলগুলি থাকবে, ততদিন এ সব চলতেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে।

তা হলে কিছু করার নেই? না, অবশ্যই করার আছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে, লড়াই করতে হবে। সরকারকে বাধ্য করতে হবে দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার জন্য। আবার এটাই শুধু নয়। এর সাথে যেটা প্রয়োজন, আমরা জনগণকে বলি, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় পাবলিক কমিটি গড়ে তুলুন। সৎ যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন। যেখানেই এ সব জিনিস ঘটবে, সেখানেই তারা প্রতিরোধ করবে, বাধা দেবে। এটা প্রয়োজন। পুলিশের দিকে তাকিয়ে, সরকারের দিকে তাকিয়ে এর সমাধান নেই। যেমন করে আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছে মেয়েরা, পুরুষরাও নেমেছে, তেমনি করে সক্রিয় ভাবে পাড়ায় পাড়ায় নামতে হবে। সজাগ থাকতে হবে, কোথাও কিছু ঘটলে ছুটে যেতে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অত্যাচারীর শাস্তিবিধানে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। এটা প্রয়োজন।

আরেকটা হচ্ছে, বিকল্প একটা নৈতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। থ্রি-ফোর-ফাইভের ছেলেমেয়েরা সেক্স নিয়ে আলোচনা করে। সেক্সে ইনভলভড হয়ে যাচ্ছে। কোথায় সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে এই সব শাসক দলগুলি আর শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি? মানবিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছু থাকছে না।

আর ঠিক একই কারণে বাবা-মাকে সম্পত্তির জন্য খুন করছে, ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। পারিবারিক জীবন ভেঙে পড়ছে। স্নেহ-মায়া-দয়া-মমতা বলে কিছু থাকছে না। এ একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। মনুষ্যদেহী, মানবিক মূল্যবোধ বর্জিত একটা নতুন ধরনের জীব সৃষ্টি করছে। এক রকম বলতে গেলে, গোটা সমাজ প্রায় পচা-গলা বিকৃত শবদেহের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এত করেও মনুষ্যত্ব যে এখনও সবটা ধ্বংস করতে পারেনি তার প্রমাণ এই ঐতিহাসিক আন্দোলন।

আরেকটা জিনিস আমরা চাই। পাড়ায় পাড়ায় স্কুলের ছুটির দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে, কিশোর-যুবকদের নিয়ে খেলাধূলা, নাটক, গান করা— এগুলি চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আর এ দেশের মনীষীদের নিয়ে— রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরাও ফুলে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সি আর দাশ, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন, প্রীতিলতা— এঁদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে চর্চা হোক। ছোটরা জানুক। তার দ্বারা তারা উৎসাহিত হবে, অনুপ্রাণিত হবে। এই পরিবেশটা সৃষ্টি করতে হবে। একটা নতুন মূল্যবোধ দিতে হবে। এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা আমাদের মহান নেতা বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ খুব জোর দিয়ে বলে গেছেন। আমাদের দলের কর্মীদেরও বলে গেছেন— নবজাগরণের মনীষীদের থেকে, স্বদেশি আন্দোলনের মহান যোদ্ধাদের থেকে শেখো। এঁদের থেকে শিখে আরও এক ধাপ এগিয়ে তারপর কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হবে। আমাদের দলে এর সাধনা চলে।

দেশের পরিস্থিতি খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু হা-হুতাশ করে কোনও লাভ নেই। হতাশার দ্বারা কোনও সমাধান হবে না। এগিয়ে আসতে হবে— একদিকে পাবলিক কমিটি চাই, ভলান্টিয়ার বাহিনী চাই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকরা স্কুলে উদ্যোগ নিয়ে এগুলি গড়ে তুলুন। পাড়ায় যুবকরা গড়ে তুলুক। পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিকল্প সাংস্কৃতিক, নৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ছোটদের শিক্ষার জন্য, যাতে তারা একটা নতুন মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

এই যে সামাজিক জাগরণ, যেটা ঘটেছে, এটা কি এ ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা নিতে পারে? কীভাবে এটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

অবশ্যই পারে। যারা আজকে লড়াই করছেন, আন্দোলন করছেন, তাদের কাছে আমরা যে আবেদন করছি, তার ভিত্তিতে যদি তারা ক্রিয়া করেন, তা হলে অবশ্যই পারবে।

ছত্তিশগড়ে এসইউসিআই(সি)-র সভা

এস ইউ সি আই (সি)-র ছত্তিশগড় রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে

১২ সেপ্টেম্বর ১৬ দফা দাবির সমর্থনে রায়পুরের গান্ধী ময়দানে এক সভা হয়। গোটা রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুব-মহিলা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-বিজ্ঞান কর্মী ও মনরেগা শ্রমিকরা যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ হারোড়ে, সদস্য কমরেড আত্মারাম সাহু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কমরেড সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণে কমরেড প্রভাস ঘোষের শোকবার্তা

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি ১২ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ওই দিনই দিল্লির একেজি ভবনে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের উদ্দেশে পাঠানো এক শোকবার্তায় বলেন, আমার দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরির অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর মৃত্যুতে সিপিআই(এম) দলের বিরাট ক্ষতির পাশাপাশি বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও ক্ষতি হল। তাঁর শোকগ্রস্ত পরিবার এবং দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই।

১৪ সেপ্টেম্বর একেজি ভবনে প্রয়াত কমরেড সীতারাম ইয়েচুরির মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ ও দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা।

'মহর্ষি সন্দিপনী রাষ্ট্রীয় বেদ সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ড' শিক্ষাকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে দেবে

জাতীয় স্তরে 'মহর্ষি সন্দিপনী রাষ্ট্রীয় বেদ সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ড' গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর ১৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, 'মহর্ষি সন্দিপনী রাষ্ট্রীয় বেদ সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ড' সৃষ্টি হয়েছিল মহর্ষি সন্দিপনী রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে। এই বোর্ড 'বেদ ভূষণ' ও 'বেদ বিভূষণ' নামে দশম ও দ্বাদশ মানের যে সার্টিফিকেট দেয় তা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য বলে ২০২২ সালে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস' স্বীকৃতি দিয়েছিল। এআইইউ-এর কর্মকর্তারা এই কাজ কেমন করে করলেন তা বোধগম্য নয়।

বেদ ও সংস্কৃত শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে ভারতীয় জ্ঞানধারা নামে যে বিষয় চালু করা হয়েছে তা অবৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানের নামে আজগুবি বিষয় শেখানোর চেষ্টা করছে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হল, আইআইটি মান্ডিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রদের পঠন-পাঠনের জন্য 'ইন্ট্রোডাকশন অফ কনসাসনেস অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং'-এ পুনর্জন্মের উপর কোর্স চালু করেছে। মাদ্রাসা বোর্ড এতদিন চালু আছে এই যুক্তি তুলে যাঁরা এই বোর্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ কাজ করেছেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর এই বোর্ডকে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি দেওয়া হল। সমস্ত পদক্ষেপই অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে দেওয়া হবে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।

রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলনে এআইডিওয়াইও

রেলে সাড়ে তিন লক্ষ পদ শূন্য। কর্মীর অভাবে গত চার বছরে ১৬২টি রেল-দুর্ঘটনা ঘটেছে। তা সত্ত্বেও কোনও নিয়োগ হচ্ছে না। দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারতীয় রেল ব্যবস্থাকে আজ কর্পোরেটদের লুটের মৃগয়াক্ষেত্র বানানো হয়েছে। গত এক দশক ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ নীতি নিয়ে দূরপাল্লার মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণি ও স্লিপার কোচের সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়ে বাতানুকুল কোচের সংখ্যা বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কঠিন করে তুলেছে। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষ প্রবল অসুবিধায় পড়ছেন। প্রবীণ নাগরিকদের টিকিটে ছাড় পাওয়ার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় কমিটি ১২ সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছিল। অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ এবং পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য আরও বেশি কর্মী নিয়োগ, রেলের বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা, অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণি ও স্লিপার কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সম্পূর্ণ অসংরক্ষিত ট্রেন চালু, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ট্রেন ভাড়ায় ছাড় পুনরায় চালু প্রভৃতি দাবিতে তারা বিক্ষোভ দেখায়। তৎকাল প্রিমিয়ামের নামে জুলুমবাজি বন্ধ, দুর্ঘটনা বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে তারা সোচ্চার হন।

পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রেলের ডিআরএম দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

● **ত্রিপুরা ঃ** সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এ দিন আগরতলা রেল স্টেশনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে এবং সেখান থেকে এক প্রতিনিধিদল রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উদ্দেশে এক স্মারকলিপি স্টেশন ম্যানেজারের হাতে তুলে দেন।

● **পশ্চিমবঙ্গ ঃ** শিয়ালদহ, মালদা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, আদ্রা ও খড়গপুর— রাজ্যের এই ছ'টি জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও ডিআরএম ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। অন্যান্য ডিআরএম দফতরে ইমেল মারফত ডেপুটেশন পাঠানো হয়।

● **কলকাতা ঃ** কলকাতায় সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে যুবকরা কলেজ স্ট্রিটে এক বিক্ষোভ সভায় সমবেত হন। আর জি করের নির্যাতিতা 'অভয়া' স্মরণে শোকবেদিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল। এক মিনিট নীরবতা পালন হয়। রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্যের শেষে সুসজ্জিত একটি মিছিল শিয়ালদহ স্টেশন অভিমুখে যায় (ছবি)। সেখানে একটি বিক্ষোভ সভা হয়।

এখান থেকে সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধিদল শিয়ালদহ ডিভিশন-এর ডিআরএমকে ডেপুটেশন দেন। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কোষাধ্যক্ষ কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম স্মারকলিপিতে উত্থাপিত দাবির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন।

কলকাতা

● **শিলিগুড়ি ঃ** শহরের এয়ারভিউ মোড় থেকে দুই শতাধিক যুবকের সুসজ্জিত মিছিল হিলকার্ট রোড হয়ে হাসমি চকে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাদল পাল, সুজয় লোধ, দার্জিলিং জেলা কমিটির ইনচার্জ ধনঞ্জয় রায় প্রমুখ। প্রতিনিধিদল এডিআরএম-এর মাধ্যমে রেলমন্ত্রী ও এডিআরএম (কাটিহার ডিভিশন)-এর কাছে স্মারকলিপি পাঠান। হাসমি চকে আর জি করের নির্যাতিতা 'অভয়া' স্মরণে শহিদ বেদি রেখে বিক্ষোভ অবস্থান চলে।

● **মালদা ঃ** এ দিন মালদা ডিআরএম দফতরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। রথবাড়ি মোড় থেকে কয়েকশো যুবক মিছিল করে রেল দপ্তরের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান। মূল দাবিগুলি ছাড়াও মালদা থেকে হাওড়া-শিয়ালদা পর্যন্ত দুপুরের দিকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো, আজিমগঞ্জ-মালদা প্যাসেঞ্জারকে কাটিহার পর্যন্ত চালানো, মালদা থেকে কাটিহার নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন সহ বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ইসরাফুল হক ও রাজ্য কমিটির সদস্য উজ্জ্বলেন্দু সরকার। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক মাইতি, সুশান্ত ঢালী প্রমুখ। মিছিলে রেলের দাবি ছাড়াও আরজিকর ঘটনার দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তির দাবি তোলা হয়। সভা থেকে জনসাধারণকে রেলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এবং সাধারণ যাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

শিলিগুড়ি

আগরতলা, ত্রিপুরা

পাঠকের মতামত

গণদাবী বিভ্রান্তি দূর করে

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম গণদাবী কাগজটি আমার চোখে পড়ে একটি মেলাতে। সেই প্রথম 'শিবদাস ঘোষ' এই মহান মানুষটির নাম এবং সত্যিকারের বিপ্লবী দল এই ইউ সি আই (সি)-র নাম আমি জানতে পারলাম। আমি বলব— এই মহামূল্যবান পত্রিকাটির মাধ্যমে দেশের অত্যন্ত গরিব মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখা মানুষগুলির কোথায় কোথায় বিভ্রান্তি আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ধর্ম এবং সর্বোপরি রাজনীতি নিয়ে সিপিএম এবং এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য কোথায়— এ সব নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখুন।

কেউ কেউ এখনও মনে করে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে শিল্পে বাধা দিয়ে এসইউসিআই(সি) খুব অন্যায় ও ভুল কাজ করেছে। আমি বলি, গুজরাটের সানন্দে শুরুতে কতগুলো ন্যানো গাড়ি উৎপাদন হত, এখন ওখানে কত উৎপাদন হচ্ছে, কতজন শ্রমিক আছেন, এলাকার কতখানি উন্নতি হয়েছে, বাজারের হাল কেমন— এইসব তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত মানুষের চোখ খুলে দেওয়ার দায় গণদাবীর। আর একটি কথা— বাজারি কাগজগুলি, টিভি এবং স্মার্ট ফোন সমাজে নিত্যদিন যে সব বিভ্রান্তি এবং মিথ্যা ছড়ায়, জনগণের দৃষ্টিকে কৌশলী কথায় আচ্ছন্ন করে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার মরিয়া প্রয়াস চালায়, এর যোগ্য জবাব সুস্পষ্ট করে সচেতন জনগণের জন্য আলাদা একটি শিরোনামে লেখা প্রয়োজন। অবস্থা যা, তাতে গণদাবী দৈনিকের দাবি করে।

শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও শিক্ষার সান্নিধ্য না পেলে অনেক অভাবী মানুষের মতো আমি হয়তো উন্মাদ হতাম বা আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি নিতাম। কিন্তু না, ওই মহামানবের শিক্ষা, জ্ঞান, চরিত্রসাধনা আজও আমাকে চলার পথে প্রতিকূলতার মধ্যে, দারিদ্রের মধ্যেও পথ চলার প্রেরণা দেয়। আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে দেয়। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আমার কিশোর মনে প্রবল ছাপ ফেলেছিলেন 'নীতি নৈতিকতার সঙ্কট প্রসঙ্গে' মূল্যবান একটি পুস্তিকার মাধ্যমে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিয়ে উস্তির একটি ছাত্রসভায় তাঁর একটি মূল্যবান ভাষণ এখনও স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল।

শিবদাস ঘোষের অজস্র মূল্যবান শিক্ষা থেকে দুটি কথা বলছি— "সমালোচক মাত্রেই শিক্ষক। তিনি ঘরের লোক হোন বা বাইরের, এমনকি শত্রু হলেও আমি মনে করি তিনি শিক্ষক।" তিনি বলতেন, "আমি গাছতলাতে আছি, হয়তো গাছতলাতেই মরব, হয়তো রাস্তায় পড়ে মরব, হয়তো কেউ আমার খোঁজও পাবে না মৃত্যুর পর। কিন্তু যা সত্য বলে বুঝেছি— তাই নিয়েই চলব, তাই নিয়েই লড়ব। হয়তো আমাকে গুলি করে মারা যাবে কিন্তু আমাকে কেনা যাবে না।" আমৃত্যু এই দুটি কথা আমি ভুলব না। যদি পারেন সবাই কথাগুলি বুকে গেঁথে নিন। এটাই এখনকার দাবি।

শ্যামল হালদার

মৌতেশিয়া, হাওড়া

রাজ্যসভায় আরএসএসের বিরুদ্ধে কিছু বলাই যাবে না!

সমাজবাদী পার্টির এক সাংসদের আরএসএস সংক্রান্ত কিছু তথ্যের প্রসঙ্গে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় সম্প্রতি বলেছেন, আরএসএস ভারতের ইতিহাসে সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য স্মরণীয়। তার সমালোচনা করা অন্যায়, অসাংবিধানিক। রীতিমতো রুলিং জারি করে তিনি আরএসএস সদস্যদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছেন। এর আগে তিনি একইভাবে মল্লিকার্জুন খড়্গের আরএসএস সম্পর্কিত মন্তব্য সংসদের রেকর্ড থেকে মুছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ধনখড়জির এই ভূমিকা কি গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আরএসএস-কে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি থাকতেই পারে। সংগঠনটি নিয়ে তিনি স্পর্শকাতর হতেই পারেন। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত দিক। কিন্তু এই সংগঠনটির কাজ-কর্ম নিয়ে গণতন্ত্রের উচ্চতম প্রতিষ্ঠান সংসদে কোনও আলোচনা করা যাবে না— এই ফতোয়া তো স্বৈরতন্ত্রের প্রতিধ্বনি! রাজ্যসভার মতো ফোরামের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর নিরপেক্ষতা প্রত্যাশিত। এটা রক্ষা করা তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব। দুর্ভাগ্য, তাঁর আচরণে সেটা দেখা যাচ্ছে না।

তিনি আসলে আরএসএসের ধাঁচেই চলছেন। আরএসএস-এর কর্মপদ্ধতি হল ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাকে হত্যা করা। রাষ্ট্রের ছাঁচে ফেলে মানুষকে শাসকের অনুগত দাসে পরিণত হওয়ার ট্রেনিং দেয় আরএসএস। দেশের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা বিশেষ নেই। বেকারত্ব বা বৈষম্য বাড়ল না কমল, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতিতে জনগণের হাল কী দাঁড়াল, কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পেল কি না শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝা কতখানি চাপল, মজুরি কতখানি কমিয়ে দেওয়া হল তা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়।

অথচ এগুলিই আজ আমাদের দেশে মূল জাতীয় সমস্যা রূপে অবস্থান করছে। যারা জাতির উন্নতি বা সেবায় নিয়োজিত বলে দাবি করবে, তারা এই সমস্যাগুলি সমাধানে মাথা ঘামাবে না? এ দেশের নবজাগরণ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত বড় মানুষদের আমরা দেশের এই সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবতে এবং পরিপূরক ভূমিকা নিতে দেখেছি। মানুষকে সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করে সমাজে বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী চেতনা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সেদিন তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সেটাই ছিল সমাজে তাঁদের বিশিষ্ট মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার মূল পাথেয়। আরএসএসের কোনও নেতা বা কর্মকর্তাকে এই ধরনের ভূমিকায় কি কোনও দিন কেউ দেখেছে? আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার দেশের সিংহভাগ গরিবের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সম্পদ বৃদ্ধির নীতি প্রণয়ন করে চলেছে। ধনখড়জি যখন আরএসএসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন আরএসএস কী ভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে জাতিকে সেবা করে চলেছে, তা যদি তিনি বলে দিতেন মানুষের বড় উপকার হত।

আরএসএস-এর মডেলে বিজেপি জমানায় দেশে প্রাচীন ঐতিহ্য জানার নামে ধর্মীয় শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, কুসংস্কার প্রভৃতির প্রসার ঘটানো হচ্ছে। সর্বস্তরে ইতিহাস বিকৃত করা,পুরাণকে ইতিহাস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, যথার্থ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে বাদ দেওয়া প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। নবজাগরণ, জাতীয়তা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছে বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার মধ্যেও আছে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ। আরএসএস যে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জাতীয়তার কথা বলে, সেটা আসলে কৃত্রিমভাবে দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া একটা বিষয়। ভারতীয় জাতি গড়ে ওঠার দীর্ঘ ইতিহাস বলে, বহু জাতিসত্তা, বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষ, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির উত্তরাধিকার মিলে ভারতীয় পরিচয় গড়ে উঠেছে। একমাত্রিক ছাঁচে ঢালা হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির ফরমুলা কোনও মতেই ভারতীয় বলে চালানো যায় না। ধনখড়জির জেনে রাখা ভাল, ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একদিন এ দেশে গড়ে উঠেছিল। ইতিহাস বলছে, আরএসএস ছিল এই ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী। জাতীয়তাবাদ নিয়ে আরএসএসের গুরু গোলওয়ালকরের মন্তব্য নিশ্চয়ই ধনখড়জির জানার কথা। গোলওয়ালকর তাঁর 'উই অর আওয়ার নেশানহুড ডিফাইন্ড' বইতে পরিষ্কার বলছেন 'হিন্দুরা স্মরণাতীত কাল থেকে এ মাটির সন্তান এবং এ দেশের স্বাভাবিক প্রভু'। এই চিন্তা এ দেশের গৌরবোজ্জ্বল গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সংগ্রামী ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এই গোলওয়ালকর স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধাদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করেছিলেন। ব্রিটিশরা যে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি চেয়েছিল তার অন্যতম মদতদাতা ছিল এক দিকে মুসলিম লিগ অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আরএসএস যোগ দেয়নি। ১৯৩৯ সালে সাভারকর গোপনে ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন যে 'ব্রিটিশ ও হিন্দুদের পরস্পর বন্ধু' হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সংবিধান স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে গোলওয়ালকর তাঁর 'বাঞ্চঅফ থটস' রচনায় পদে পদে বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তার মত ছিল সকলের হিন্দুত্বকে মেনে নেওয়াই হল ধর্মনিরপেক্ষতা। যেহেতু হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই আরএসএস সঠিক বলে মনে করে, তাই সেই সময় আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলন বয়কট করেছিল। আরএসএসের চোখে দেশবন্ধু, নেতাজি, লালা লাজপত রাই, গান্ধীজি, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্য সেনরা ছিলেন বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু। এই হচ্ছে আরএসএসের জাতীয় অগ্রগতিতে নিয়োজিত থাকার নমুনা। ধনখড় জির 'রুলিং' মেনে আরএসএস-এর মতো মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে দেশসেবার দায়িত্ব দিলে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের যতটুকু ছিটেফোঁটা রয়েছে তা যে পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আরএসএসের মদতে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এ দেশের যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক, সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দেশকে ধর্মান্ধ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আর এ সবই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার করে চলেছে আরএসএসের নির্দেশেই।

আজ সমগ্র দেশ যখন বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, চুরি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, ক্ষুধা, আত্মহত্যা, শিশু মৃত্যু সহ বিভিন্ন সমস্যায় বিপর্যস্ত, তখন এ দেশের মহান মনীষীদের স্বপ্নকে সামনে রেখে যুগোপযোগী আদর্শকে পাথেয় করে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-প্রদেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই একমাত্র দেশ তথা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঠিক লক্ষ্য পূরিত হওয়া সম্ভব। এর বিপরীতে পুঁজিপতিদের আড়াল করতে মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিকে ধ্বংস করে দেশকে ফ্যাসিবাদের দিকে নিয়ে যাওয়াই হল আরএসএস তথা বিজেপির লক্ষ্য।

লোনের বাইক ট্যাক্সির বাণিজ্যিক পারমিটের দাবি আদায়

১২ সেপ্টেম্বর পরিবহণ দপ্তরের সচিবদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সভাপতি শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে সহ-সম্পাদক শুভব্রত দাস ও কার্যকরী কমিটির সদস্য দীপম কর্মকার উপস্থিত ছিলেন। দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়, লোন থাকার জন্য যাঁরা বাইকের কমার্শিয়াল নাম্বার প্লেট করতে পারছিলেন না, এবার তা করতে পারবেন। ২১ সেপ্টেম্বর সল্টলেক আরটিও দপ্তরে পরিবহণ দপ্তর সকলকেই কমার্শিয়াল পারমিট দেবেন এবং যাত্রীসাথী অ্যাপে যুক্ত করে নেবেন। যাদের বাইক ইএমআই-তে আছে তাদের পুরনো নম্বরই থাকবে, শুধু প্লেটের রঙ হলুদ হবে।

পরিবহণ দপ্তর আরও ঘোষণা করে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই পেশার সাথে যুক্ত সকলকেই তাদের বাইক কমার্শিয়াল পারমিট অথবা হলুদ প্লেট করে নিতে হবে। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়ন প্রথম থেকেই কমার্শিয়াল পারমিট ও বাইক চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতির দাবিতে লড়াই করে আসছে। সভাপতি শান্তি ঘোষ বলেন, এই ঘোষণা দীর্ঘদিনের আন্দোলনের জয় যা বাইক চালকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব অ্যাপ যাত্রীসাথীতে বাইক ট্যাক্সিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তার অনবোর্ডিং করানো হচ্ছে।

পুঁজিবাদী চিনে আজ বেকারত্বের হাহাকার

হায় চিন! একদা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চিনের কাঁধে আজ বেকার সমস্যার ভারী বোঝা। পুঁজিবাদী পথে হেঁটে চিনের সরকার আজ নাগরিকদের এমন উজ্জ্বল দিনই উপহার দিয়েছে!

প্রকাশিত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে কোভিড অতিমারির পর থেকে বেকার সমস্যা ব্যাপক ভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে চিনে। গত বছর এপ্রিলের সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সেখানকার ১৬-২৪ বছর বয়সী প্রায় ১০ কোটি কর্মপ্রার্থীর ২০ শতাংশেরও বেশি ছিলেন বেকার। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যতই কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা বলুন না কেন, বছর পার করে ২০২৪-এর জুলাইয়েও দেখা যাচ্ছে চিনে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ১৭.১ শতাংশে। উচ্চশিক্ষা শেষ করলেই মোটা বেতনের চাকরির সুযোগ এবং তার দৌলতে নিশ্চিন্ত দিন কাটানোর স্বপ্ন ক্রমেই অধরা হয়ে উঠছে চিনের যুবসমাজের কাছে। কেউ সংসার চালানোর বাধ্যতায় ঢুকে পড়ছেন কম বেতনের যা পাওয়া যায় তেমন কাজেই। কেউ চাকরি খোঁজা ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের পেনশনে ভরসা করে দিন কাটাচ্ছেন। আবার অনেকে চরম হতাশাগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়ে অপরাধজগতের ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্মকেই আশ্রয় করছেন। চাকরি নিয়ে চলছে নানা দুর্নীতিও, যা চিনের সামাজিক পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলছে।

হুবেই ইউনিভার্সিটি অফ চাইনিজ মেডিসিনের স্নাতক আমাডা চেনের স্বপ্ন ছিল তিনি গবেষক হবেন, কিংবা কোয়ালিটি ইন্সপেক্টরের কাজ করবেন। সুযোগ মেলেনি। শেষে তাঁকে ঢুকতে হয় সেলসের কাজে। সেখানে সারা দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হত। বিনিময়ে মিলত সামান্য টাকা। বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে না পারলেই শুনতে হত বসের গালিগালাজ। শেষ পর্যন্ত কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

রাজধানী বেজিংয়ের প্রখ্যাত ফরেন অ্যাফেয়ার্স ইউনিভার্সিটির ছাত্র জেফাইর কাও-এরও প্রায় একই অবস্থা। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটি হাতে নিয়ে বছরের পর বছর পুরো সময়ের কাজ খুঁজে গেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২৭ বছর বয়সে পৌঁছে বুঝতে পেরেছেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী যে কাজ তাঁর পাওয়ার কথা, তা জোটার আশা নেই। তাই গ্রামে ফিরে আপাতত বাবা-মায়ের পেনশনেই ভরসা রেখেছেন কাও।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে মহান মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর হাজার হাজার বছরের অন্ধকারে তলিয়ে থাকা চিনে ধীরে ধীরে জ্বলে উঠেছিল উন্নয়নের আলো। দেশের সমস্ত মানুষের জন্য শুধু খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান নয়, সকলের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক চিনে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক উন্নত মানের জীবনযাত্রার অধিকারী হয়েছিলেন। ঘুচে গিয়েছিল মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য। অতীতের অনাহার আর শোষণ-বঞ্চনার কালো দিন পেরিয়ে এসে মাথা উঁচু করে বাঁচার মর্যাদাময় জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন চিনের মানুষ।

১৯৭৬-এ মৃত্যু হয় চিন বিপ্লবের রূপকার মহান মাওয়ের। এর পর ক্ষমতা দখল করেন সংশোধনবাদী নেতা দেং শিয়াওপিং। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রধান হন তিনি। ক্ষমতায় বসে সমাজতন্ত্র ধ্বংসের মতলবে 'মাও সে তুং জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নানা কৌশলে তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকেন। যে কোনও উপায়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে— এই ধুয়া তুলে ১৯৭৮-এ চিনের অর্থনীতিতে তিনি সংস্কার ও মুক্ত-দুয়ার নীতি চালু করেন। নাম দেওয়া হয় 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি'। তাঁর বিখ্যাত লব্জ ছিল— 'বেড়াল যতক্ষণ ইঁদুর ধরতে পারছে, ততক্ষণ তার রঙ সাদা না কালো, তা দেখার দরকার নেই'। অর্থাৎ পুঁজি ব্যবহার করে উৎপাদন করতে পারলেই হল, সেই পুঁজি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, নাকি জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠনের পথে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে— তা বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। চিনের শাসক দলও মানুষকে ধোঁকা দিতে কমিউনিস্ট পার্টি নামটি বজায় রেখেই পুরোপুরি একটি বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হয়ে যায়।

সরকারের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশি পুঁজি মুনাফা লুটতে ঢুকতে থাকে চিনের মাটিতে। ক্রমাগত বাড়তে থাকে বেসরকারি পুঁজিপতির সংখ্যাও। চিনের সস্তা শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে ক্রমাগত মুনাফা বাড়াতে থাকে তারা। পরিণামে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার গতি পায় এবং জাতীয় আয়ও বাড়ে। কিন্তু একই সঙ্গে বাড়তে থাকে চিনা শ্রমিক-কর্মচারীদের শোষণ-বঞ্চনার মাত্রা। কারণ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাটির ভিত্তিই হল শ্রমিককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে মালিকের মুনাফা-লুটের বন্দোবস্ত করা। চিনে একের পর এক গজিয়ে উঠতে থাকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এসইজেড, যেখানে মালিকের মুনাফার স্বার্থে শ্রম-আইন বা শ্রম-অধিকারগুলির কোনও অস্তিত্বই থাকে না। পরিণামে, যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করে দিয়েছিল মাও সে তুংয়ের চিন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথে হেঁটে দেং শিয়াওপিং-এর চিনে আবার উঁকি দিতে থাকে তার বীভৎস চেহারা।

পুঁজিবাদী চিন আজ এক বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আধিপত্যের সম্প্রসারণ ঘটাতে সামরিক শক্তি বাড়ানো, বাণিজ্যিক নানা কৌশল গ্রহণ ইত্যাদি কোনও কিছুকেই আজ চিনের সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বাদ দেন না। চিনের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আজ বিপুল সম্পদের অধিকারী। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মেই সেখানে মানুষে মানুষে আজ বিপুল বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। রমরমা হয়েছে দুর্নীতিরও। সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর হতে থেকেছে বেকার সমস্যা। জাতীয় আয়ের দিক থেকে চিন আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। অথচ আজ এই বিপুল সম্পদশালী দেশটির বাতাস প্রতি মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠছে বেকারত্বের জ্বালায় জর্জরিত লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম তরুণ-তরুণীর দীর্ঘশ্বাসে। বাস্তবে পুঁজিবাদী উন্নয়নের আর্থিক সাফল্য কুড়োচ্ছে চিনের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি, আর তার ক্লেদ-কুফলগুলি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম।

ভারতও নাকি অচিরেই পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হতে চলেছে। অন্তত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো তেমনই দাবি করেন। অথচ দেশে বেকার সমস্যা গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। কর্মহীনতার চেহারা এতটাই বীভৎস যে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশই বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কর্মহীন তারুণ্যের আর্তনাদ যাঁদের কষ্ট দেয়, যাঁরা সত্যিই বেকারত্বমুক্ত দেশ চান, যাঁরা জাতীয় আয়ের অঙ্কটির বিশালতা দিয়েই শুধু দেশের উন্নয়ন মাপেন না, তাঁরা মাও সে তুংয়ের সমাজতান্ত্রিক চিন থেকে আজকের পুঁজিবাদী চিনের ক্রম-অধোগমন খতিয়ে দেখলে বেকার সমস্যা সমাধানের সত্যিকারের পথটির খোঁজ অবশ্যই পাবেন।

টিফিন ভাগ করে খাওয়ার আনন্দেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ

উত্তরপ্রদেশের বছর সাতেকের ছেলেটি ভাগ্যিস সংবিধান পড়েনি! সে জানে না, সংবিধানে লেখা আছে আমাদের দেশ 'ধর্মনিরপেক্ষ'। সে না জানলেও সেখানে সরকারে আসীন বিজেপির যেসব নেতা-মন্ত্রী সংবিধান ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন, তাঁদের তো এটা জানার কথা ছিল। উত্তরপ্রদেশে আমরোহার হিল্টন স্কুলের হেডস্যারও নিশ্চয়ই জানেন, গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের নিজস্ব খাদ্যাভ্যাসে আইন আদালত পুলিশ প্রশাসন কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অথচ তাঁর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র টিফিনে বিরিয়ানি আনার 'অপরাধে' স্কুল থেকে বরখাস্ত হয়েছে শুধু নয়, এ নিয়ে তার মায়ের অভিযোগের উত্তরে প্রধান শিক্ষক যা বলেছেন, শুনলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে হয়। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মাকে ওই প্রধান শিক্ষক বলছেন, বন্ধুদের সঙ্গে ওই আমিষ টিফিন ভাগ করে খেতে চেয়ে আসলে সে তাদের ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষক হয়েও কোনও আইন, নৈতিকতা বা মানবিকতার পরোয়া না করে একটি শিশুর সামনে তার খাবার নিয়ে, ধর্মপরিচয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করতে তাঁর আটকালো না! এমনকি এর জন্য তাকে স্কুল ছাড়তে বলতেও বাধল না তাঁর! পেশায় শিক্ষক হলেও তাঁকে আর যাই হোক, মানুষ গড়ার কারিগর বলা যায় না।

প্রশ্ন হল, আমিষ পদ কি শুধু একটি বিশেষ ধর্মের মানুষই খেয়ে থাকেন? অন্যেরা খান না? কোন যুক্তিতে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের এই দেশে স্কুলে আমিষ খাবার আনা নিষিদ্ধ করে নিরামিষ খাবার বাধ্যতামূলক করা যায়? এমন নিয়ম যদি থাকেও, তা ভাঙলে এমন 'গুরুতর' শাস্তি দেওয়াই কি অপরাধ নয়? চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যায়, আমিষ-নিরামিষ এখানে উপলক্ষ মাত্র। আসল হল তীব্র মুসলিম-বিদ্বেষ, যা বিজেপি শাসিত ভারতবর্ষ জুড়ে নানা ঘটনায় দগদগে ক্ষতের মতো ফুটে বেরোচ্ছে। বিজেপি শাসনে ফ্রিজে গোমাংস রাখা বা গোমাংস খাওয়ার সন্দেহেই মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা যায়। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত কোন মাসে আমিষ খাওয়া যাবে না তার নিদান দিতে পারেন! প্রকাশ্য জনসভায় শাসক দলের নেতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলার নিদান পর্যন্ত হাঁকতে পারেন। এই আগস্টেই হরিয়ানায় সাবির মল্লিক ও আরিয়ান মিশ্রের নৃশংস হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আরিয়ানকে 'মুসলিম ভেবেই গুলি করেছিলাম'— এ কথা বলতে দ্বিধা করেনি বিজেপির মদতপুষ্ট গো-রক্ষক বাহিনীর এক সদস্য। কাজেই, আমরোহার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রমী বলার কোনও অবকাশ আজ আর নেই। ওই প্রধান শিক্ষকও নিশ্চিন্তে এবং নির্ভয়ে এই কাজ করতে পেরেছেন শাসক বিজেপির সমর্থনের ভরসাতেই।

হায় রে স্বাধীন দেশ! একদিন এই দেশের স্বাধীনতার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল আর আসফাকুল্লা খান! নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজে সব ধর্মের সৈনিকের একসঙ্গে বসে খাওয়ার প্রথা চালু করেছিলেন। বিজেপি ছাড়া অন্য শাসক দলগুলি এর আগে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেছে এমন আদৌ নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেনি। যার প্রভাবে এ দেশে স্বাধীনতাও এসেছে দেশভাগের মতো সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সাথে আপস করেই। স্বাধীন দেশের সমাজ মননেও ধর্মীয় বিভেদের বীজ রয়ে গেছে প্রবলভাবে। কিন্তু বিজেপি জমানায় সেই বীজ যেভাবে ডালপালা মেলছে, আরএসএস গুরু গোলওয়ালকরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অহিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখার মানসিকতা যেভাবে স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত করার চেষ্টা হচ্ছে, সে 'কৃতিত্ব' অবশ্যই নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর মন্ত্রিসভার। তাই স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর পার করে যখন আমাদের জাত-ধর্ম-বর্ণের প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, স্কুলের টিফিনবেলায় মৈনাক আর মইদুলের পায়েস আর বিরিয়ানি ভাগাভাগি করে খাওয়ার কথা ছিল, গাছতলায় বসে সুখদুঃখের গল্প করার কথা ছিল রুমা আর রুকসানার, তখন সাত বছরের একটি নিষ্পাপ বালক জানল, সে মুসলমান বলে হিন্দু বন্ধুদের সাথে খাবার ভাগ করে খাওয়া অপরাধ। সেই অপরাধে ওই স্কুলে আর পড়াই হবে না তার!

একটা লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গড়া হলেও ওই প্রধান শিক্ষকের যথারীতি কোনও শাস্তি হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়েছে, বহিষ্কৃত বাচ্চাটির বকেয়া টাকা মকুব করে দেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এটাই নাকি স্কুলের তরফে 'ক্ষতিপূরণ'! কিন্তু এই ঘটনা শিশুমনটিতে যে ভয়ঙ্কর অভিঘাত তৈরি করল, সারাজীবন ধরে হয়তো তাকে সে যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হবে। ক্ষতিপূরণের নামে শত শত টাকা দিলেও এই ভেঙে যাওয়া বিশ্বাসের ক্ষতিপূরণ হবে কি?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI | Volume: 77, No.: 8 | Bengali | Weekly | September 20, 2024 | Kolkata | Price: Rs. 3.00 | ৮

শহিদ যতীন দাস স্মরণ

১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অনন্য বিপ্লবী যতীন দাসের ৯৬তম শহিদ দিবস। ১৯২৯ সালের এই দিনটিতে লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর মাত্র ২৪ বছর বয়সে এই বিপ্লবী মৃত্যুবরণ করেন। এ দিন দক্ষিণ কলকাতায়যতীন দাস পার্কে শহিদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতি ও শহিদ যতীন দাস কালচারাল ফোরামের পক্ষ থেকে বিপ্লবীর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় এবং বিপ্লবীদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতি রঞ্জনপ্রসাদ দাস এবং বিপ্লবী সূর্য সেনের পরিবারের সদস্য মিতা মিত্র সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন শহিদ যতীন দাস জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক অংশুমান রায়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সম্পাদক সুবীর কুণ্ডু। ফোরামের সদস্যরা গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন।

উত্তর কলকাতায় বিপ্লবীর জন্মস্থান মামার বাড়ির পাশে সিকদার বাগান স্ট্রিটের মূর্তিতে ‘বিপ্লবী যতীন দাস স্মরণ সমিতি’র পক্ষ থেকে মাল্যদান এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সমিতির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, ভেঙে পড়া মামার বাড়িটিকে সরকার হেরিটেজ বাড়ি ঘোষণা করে বিপ্লবীর স্মৃতি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করুক।

বিহার ঃ মাড়ওয়ানে বিক্ষোভ মিছিল

ব্লক ও অঞ্চল অফিসে ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে ১২ সেপ্টেম্বর বিহার রাজ্যের মাড়ওয়ানে বিডিও দফতরের সামনে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। এর আগে গান্ধী জানকী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল সোচ্চার স্লোগান সহকারে দফতরের সামনে আসে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন মাড়ওয়ান পশ্চিম লোকাল কমিটির সম্পাদক তারকেশ্বর গিরি। সভাপতিত্ব করেন মাড়ওয়ান পূর্ব লোকাল কমিটির সম্পাদক বিপিন কুমার ঠাকুর। একটি প্রতিনিধিদল বিডিও এবং সিআই-এর সাথে কথাবার্তা বলেন। গোটা কার্যক্রমটির নেতৃত্ব দেন লালবাবু রায়, কুমোদ রাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন

আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, সরকারি কর্মীর ন্যায় বেতন, সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্ত, সেন্টারের নামে সিম কার্ড সহ অ্যান্ড্রয়েড ফোন সেট প্রদান, বাজারদর অনুযায়ী জ্বালানি ও সব্জি বিল দেওয়া সহ প্রকল্পটির সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদায় বিদ্যাসাগর হলে। ৭৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উপদেষ্টা অনুরূপা দাস, অমল মাইতি, পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা কেকা পাল, সভানেত্রী রুনা পুরকাইত, সারা বাংলা মিড-ডে মিল ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা মনোরমা হালদার প্রমুখ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত। সম্মেলন থেকে পূর্ণিমা দণ্ডপাটকে সভাপতি ও মাধবী পণ্ডিতকে সম্পাদিকা করে ৯২ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

অভয়ার ন্যায়বিচার ও শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে ছাত্রদের মহামিছিল

আর জি কর হাসপাতালে পিজিটি চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের দ্রুত তদন্ত, প্রকৃত দোষীদের শাস্তি এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচানোর দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও-র আহ্বানে ছাত্র মহামিছিল হয় কলকাতায়। রাজ্যের সমস্ত জেলার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ স্ট্রিটের সমাবেশস্থলে আসেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পল্লব পেগু, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রের সুসজ্জিত মিছিল কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলের দাবি ছিল আর জি কর মেডিকেল কলেজের নৃশংসতায় যুক্ত দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে, নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে প্রভৃতি।

মিছিল শেষে শ্যামবাজার মোড়ে একটি বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সামসুল আলম। মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই আগামী দিনে জেলায় জেলায় শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার অঙ্গীকারে লড়াই-আন্দোলন তীব্রতর করার শপথ নেন।

বিদ্যুৎ আন্দোলনে আসামের গ্রাহকরা

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে আসামের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। ১১ সেপ্টেম্বর সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক গুয়াহাটির বিদ্যুৎ ভবন ঘেরাও করে। অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর নেতৃত্বে সহস্রাধিক গ্রাহক আওয়াজ তোলেন, জনগণকে লুঠের যন্ত্র স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করতে হবে, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের ষড়যন্ত্র প্রিপেড স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে। গ্রাহকরা পল্টন বাজারের মাদ্রাসা স্কুলের সামনে সমবেত হয়ে মিছিল করে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে উপস্থিত হন। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক অজয় আচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকপত্র এপিডিসিএল-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মারফত পাঠানো হয়।

মুজফফরপুরে দলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ

বিহারে মুজফফরপুরের কুড়নী ব্লকে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে ১৩ সেপ্টেম্বর এলাকার মানুষ বিডিও দফতরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, মনরেগা শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তি, দলিত বসতিগুলোয় রাস্তা নির্মাণ, দরিদ্র মানুষের থাকার জায়গা, স্মার্ট মিটার বাতিল, কুড়নী ব্লককে খরাপীড়িত ঘোষণা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ও বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক অর্জুন কুমার, রাজ্য কমিটির সদস্য লালবাবু মাহাতো, কৃষক নেতা কাশীনাথ সাহনি প্রমুখ।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com